387

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR 14 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ?

মতামত

এ কি সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়!

মোঃ আবদুল আওয়াল মিঞা

তেত্রিশটি দীর্ঘ বছর পর আবার দিনের অর্ধেক বেলা আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে করিডোরে ঘুরে কেটে গেলো। আমার সহপাঠী এবং সমসাময়িক বন্ধুগণ যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন তাদের প্রায় সবাই এখন পূর্ণ অধ্যাপক এমন অনেকের সাথে দেখা হলো। গভীর মমতায় তাদের কক্ষে নিয়ে বসালেন। এপ্রিলের ২ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী বিশেষতঃ জাতীয়ভাবে খ্যাতিমানসম্পন্ন সিনিয়র অধ্যাপকদের অন্য ব্যস্ততার কারণে একদিনের 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড'-এর শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়া সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা একটি অতিরঞ্জন কি না আমি তাই দেখতে এবং জানতে গিয়েছিলাম। দিনের প্রায় সারাটি কর্মসময় আমার সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়েই কাটলো। অনেক তরুণ শিক্ষক এবং ছাত্রের সাথেও কথা বললাম। তরুণ শিক্ষকগণ অতি সাবধানী উচ্চারণেও যেসব কথা বললেন তা ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকেও হতাশাব্যঞ্জক। এদের বেশিরভাগই এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং যে বিভাগে আজ কর্মরত সেখান থেকেই অত্যন্ত ভাল ফলাফল করে শিক্ষকতাকে নিজেদের ভালবাসার ব্রত হিসাবে বেছে নিয়েছেন। চোখে-মুখে তাদের বুদ্ধির দীপ্তি। প্রতিটি শব্দ চয়নে আত্মোৎসর্গের দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রকাশ। সারা দেশের শুধুমাত্র সব থেকে মেধাবী ছাত্রগণই অত্যন্ত কঠিন ভর্তি পরীক্ষায় পাস করলেই তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। বিভিন্ন বিভাগের সব বর্ষের প্রায় ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে তাদেরও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াই পেলাম।

৫ই এপ্রিল সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় শুরু করেছিলাম কার্জন হল দিয়ে। রসায়ন, প্রাণ-রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ফার্মেসী অনুষদ, নৃবিজ্ঞানসহ ১০টি বিভাগের বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে এখানে কথা বললাম। তারা সবাই বললেন তরুণ শিক্ষকদের মাঝে যথাসময়ে ক্লাসে আগমন থেকে শুরু করে টিউটোরিয়াল, ল্যাব ওয়ার্কস, পরীক্ষার খাতা দেখাসহ এমনকি ব্যক্তিগতভাবেও সৌহার্দ্য, নিষ্ঠা এবং সততার সাথে তাদেরকে সাহায্য করার আপ্রাণ প্রয়াস রয়েছে। সিনিয়র শিক্ষকেরা প্রায় কেউই ১০টার আগে কোন ক্লাস নেন না এবং বেলা ১টার পর তাঁরা বিভাগেও উপস্থিত থাকেন না। অনেক সময় কোন ছুটিছাটা ছাড়াই সম্মানিত বর্ষীয়ান অধ্যাপকদের কেউ কেউ দিনের পর দিন বিভাগে অনুপস্থিত থাকেন। জুনিয়র শিক্ষকদের মাঝ থেকে তাদের ক্লাসগুলো কখনও নিয়ে নেয়া হয়। না হলে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ স্যারের প্রতীক্ষায় বসে থেকে থেকে ঘরে ফিরে যায়। অনেক সময় তাদের পূরো দিনটিই অপচয় হয়ে যায়।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আরো জানতে পারলাম সিনিয়র অধ্যাপক সাহেবরা রুটিন প্রস্তুতের সময়েই এমনভাবে তা করিয়ে নেন যাতে করে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টার মাঝেই তাঁদের ক্লাসগুলো থাকে। তাঁরা সকাল ৮টা থেকে ১০টার ক্লাসগুলো নিতে চান না। তাতে তাঁদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। আবার ১টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে চান না, কেননা তাতে তাঁদের দিবানিদ্রার বিঘ্ন হয়। ১০টার পর তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ক্লাসে যান। দায়সারা গোছের বক্তৃতা দেন। ১টা বাজার সাথে সাথেই বাসায় রওনা হয়ে যান। বাসভবনে তাঁরা কোন ছাত্রের সাথে দেখা করেন না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষকমন্ডলী এবং তাঁদের আচরণ সমস্ত জাতির জন্য অনুকরণীয়। সমাজের কোনখানে যখন কোন ধস নামে তখন তাঁরা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন জাতি তার অপরিসীম গুরুত্ব দেয়। আজ তাদের কর্মকান্ড যদি এমনি হয় তাহলে এ জাতির আর আশা করার কি থাকতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র জাতির অহংকার, তাকে এভাবে ধূলিস্মাৎ করে দেয়া হবে এটি কেউই আশা করে না। আমাদের প্রত্যাশা রইবে ভবিষ্যতে এমন দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমাদের যেন আর কখনই হতে না হয়। সে প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর কঠোরতম সংশোধনীর প্রয়োজন থাকলে সেটিও আমাদেরকে করতে হবে।

একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ২৪ ঘন্টা ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরন্তর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের মত বিদ্যাভ্যাস করবেন এটিই ছিল এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ সে আয়োজন পর্যবসিত হয়েছে সিনিয়র শিক্ষকদের মাত্র ১টি/২টি ক্লাস গ্রহণ এবং দায়সারা ক্লাস লেকচার প্রদানে। শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে আশাতেই শহরের একেবারে হৃৎপিন্ডের ভিতরে শত শত বহুতল শিক্ষক আবাসিক ভবনে অধ্যাপকমন্ডলীর অনায়াস বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। অধ্যাপক সাহেবরা বিরক্ত হলে ছাত্র-ছাত্রীগণ ভিকটিমাইজড হওয়ার ভয়ে তারা সেসব আবাসিক ভবনে যেতেও সাহস পায় না। বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাকটিক্যাল ক্লাসে সিনিয়র অধ্যাপকেরা থাকেন না বললেই চলে। জুনিয়র শিক্ষকদের উপর প্রাকটিক্যাল করানোর দায়িত্ব দিয়ে তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্য কাজে চলে যান বলে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ। একজন শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তার জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপকদের কাছে কত কিছুই জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষের ঐ ৩টি ঘন্টার বাইরে সে জ্ঞানপিপাসা মেটাবার কোন সুযোগ তাদের সামনে খোলা নেই। ছাত্র-ছাত্রীগণ অনুযোগ জানালো এর ফলশ্রুতিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান আজ ক্রমশঃ নিম্নগামী।

এর উপর নতুন উপসর্গ এসে চেপেছে প্রজ্ঞাবান শিক্ষকদের লোভনীয় কনসালটেন্সী করার সুযোগ এবং খন্ডকালীন চাকরি। এটি সিনিয়র টিচারদের অতিরিক্ত প্রাপ্তি এবং অনিবার্যভাবেই এই ফাউ উপার্জনের সুযোগ তাঁদেরকে মূল দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সে কারণেই ১২০০ শিক্ষকের মাঝে ৫০০ জনেরও বেশী আজ সেই ফাউ-এর পিছে ছুটে চলেছেন। তার উপরে আছে শিক্ষক রাজনীতি এবং জাতীয় রাজনীতির সাথে সিনিয়র শিক্ষকদের মাত্রাতিরিক্ত সম্পৃক্ততা। কবে প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধীদলীয় নেত্রী কোথায় কোন্ বক্তৃতা দিলেন, তাতে তাদের গ্রুপের মূল রাজনৈতিক দলের কৃতিত্বের বিবরণ বা স্বার্থ পরিপন্থী কি বক্তব্য রইলো, তা খুব সতর্কতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক সমাজ পর্যবেক্ষণে রাখেন। প্রতি মাসেই এসব বক্তৃতার সমর্থনে বা বিরোধিতায় ১০৮ জন এবং ৭০ জন শিক্ষকের স্বাক্ষরিত বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অভিযোগ উঠেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষকমন্ডলী বিভিন্ন পর্যায়ে লবিং-এর মাধ্যমে পার্টটাইম চাকরি এবং মোটা উপার্জনের কন্সালটেন্সী জোগাড় করে নিচ্ছেন। এরকম কাজের সংস্থান করে নিতে গিয়ে তাদের বিপুল সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। আবার সেসব কাজ জুটে যাওয়ার পর তাতেও বিস্তর সময় দিতে হচ্ছে। এসব কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময়গুলোতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ম অনুযায়ী কোন ছুটিও নিচ্ছেন না। প্রতিদিনকার ক্লাস রুটিনেই তাদের নাম থাকছে। ছাত্র-ছাত্রীগণ দৌড়-ঝাঁপ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করে; কিন্তু ক্লাস হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে টিউটোরিয়াল ক্লাস সেগুলোও কন্সালটেন্সীতে ব্যস্ত শিক্ষকবৃন্দ তাদের জুনিয়র শিক্ষকদের দিয়ে করিয়ে নেন। ফলতঃ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অর্জিত সিনিয়র শিক্ষকদের জ্ঞানভান্ডার ছাত্র-ছাত্রীদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যায়। শিক্ষার মানে নেমে আসে অনিবার্য ভাটার টান। শিক্ষকগণ পরীক্ষা নিতে সময় পান না। জুনিয়রেরা পরীক্ষা নিয়ে দিলেও তার খাতা দেখার সময়ও তারা দিতে পারেন না। ফাইনাল পরীক্ষার উত্তরপত্র কন্ট্রোলার অফিস থেকে যথাসময়ে ডেলিভারীও পেয়ে যায়। কিন্তু তা পরীক্ষা করার সময় করাই তাদের জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে। একেবারে শেষ সময়ে এসে প্রচন্ড মানসিক চাপের মাঝে তড়িঘড়ি করে এসব স্ক্রিপ্ট দেখা শেষ করতে গিয়ে তারা শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুবিচার করতে পারেন না। এসবের ফল যে কত মর্মান্তিক তা শুধু ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীগণই জানেন।

কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে এসবই ঘটে চলেছে। বলতে হয় অত্যন্ত নির্বিঘ্নভাবেই ঘটে চলেছে। অভিযোগ করার কোন জায়গা নেই। উপাচার্য রয়েছেন। তার নিয়োগও নিরপেক্ষ নয়। তাকে নিয়োগ পেতে ভোট নিতে হয়। এসব কারণে তার নিজস্ব কোটারী থাকে, থাকে পছন্দ-অপছন্দের মানুষ। তিনি প্রায় সব সময়ই এই কোটারীভুক্তদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে বসে থাকেন। যারা উপাচার্য মহোদয়কে এভাবে সঙ্গ দেন বা তাঁর সাহচর্যে ধন্য হন তারা এই বিক্রমাদিত্যের রত্নসভায় হাজির থাকাটাকে নিজেদের চাকরির অঙ্গ বলেই মনে করেন। এসব অভিযোগ আমার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বন্ধুদেরই। তাদের বক্তব্য এই যে, তারা উপাচার্যের কাছে যাওয়াটা অপছন্দ করেন না; কিন্তু এই পরিষদে পারিষদের মত বসে থাকাটাকে আত্মসম্মান বিসর্জন হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। তাই তারা সেখানে যান না। আর এই না যাওয়ার কারণে সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাঝে মাঝেই যে রত্নসম্ভার তুলে নিয়ে বিভিন্ন লোভনীয় অবস্থানে নিয়ে স্থাপন করে চলেছে তাদের সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু লবি করতে না পারার কারণে তারা এক্ষেত্রে অনেক নিরেস এবং কম যোগ্যতার শিক্ষকদের কাছে পরাজিত হচ্ছেন। সরকারী এবং বিদেশী স্কলারশীপের জন্যে মনোনয়নের ক্ষেত্রেও তারা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন বলে আমার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

ইত্তেফাক রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, পার্টটাইম চাকরি বা কন্সালটেন্সী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার মূল দায়িত্ব পালনের পর, শুধু সময় বেঁচে গেলে সেই অতিরিক্ত সময়েই করা যাবে বলে বিধান রয়েছে। কিন্তু তার জন্যে কর্তৃপক্ষের লিখিত সম্মতি নিতে হবে। এবং এরকম কাজ থেকে অর্জিত অর্থের শতকরা ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের অনুমতিই নেয়া হয় না- ১০% টাকা জমা দেয়ারতো কোন প্রশ্নই নেই। সায়েন্স এ্যানেক্স বিল্ডিং, কলা ভবন, রেজিষ্ট্রার অফিস- যেখানেই গেলাম এক এবং অভিন্ন তথ্যই পেলাম।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষকমন্ডলী এবং তাঁদের আচরণ সমস্ত জাতির জন্য অনুকরণীয়। সমাজের কোনখানে যখন কোন ধস নামে তখন তাঁরা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন জাতি তার অপরিসীম গুরুত্ব দেয়। আজ তাদের কর্মকান্ড যদি এমনি হয় তাহলে এ জাতির আর আশা করার কি থাকতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র জাতির অহংকার, তাকে এভাবে ধূলিস্মাৎ করে দেয়া হবে এটি কেউই আশা করে না। আমাদের প্রত্যাশা রইবে ভবিষ্যতে এমন দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমাদের যেন আর কখনই হতে না হয়। সে প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর কঠোরতম সংশোধনীর প্রয়োজন থাকলে সেটিও আমাদেরকে করতে হবে।

মনটা গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো, মনে পড়লো প্রচন্ড শীতের সকালে ৮টার ক্লাসে ডঃ শাজাহান প্রবেশ করতে ১ মিনিটের বিলম্বও কখনও করেন নি। প্রফেসর রেহমান সোবহানের টিউটরিয়াল ক্লাসে মনে হতো যেন প্রতিটি ছাত্রকে তিনি নিজের সন্তানের মত পড়াচ্ছেন। ডঃ মাহমুদ যখন ৫০ মিনিটের ইকনমিক থিওরীর ক্লাসে বক্তৃতা করতেন, মনে হতো একটি মানুষ এত জানেন? প্রফেসর মোজাফফর আহমদ যখন পৃথিবীর অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন বিষয়ের কোটেশন দিতেন তা অতি দ্রুত টুকে নিয়ে পরে লাইব্রেরীতে গিয়ে মিলিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম একটি মানুষ এতো হুবহু মনে রাখেন কি করে প্রফেসর নূরুল হুদা একদিন ক্লাসে আসার আগে একখানি মোটা বই সামনে নিয়ে বসেছিলেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিলো কোন এক গভীর তপস্যায় যেন মগ্ন রয়েছেন। পরে একদিন খুব সাহস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "স্যার এখনও আপনাকে কি ক্লাসে বক্তৃতা করার জন্যে পড়তে হয়"? তার উত্তর, উত্তর না বলে পরামর্শই বলা উচিত, ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, "তুমিও যদি শিক্ষক হও, প্রস্তুতি ছাড়া কোন ক্লাস নিতে যেও না।"

৫ই এপ্রিল প্রায় ৬ ঘন্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে যখন ফিরে আসছিলাম তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু একটি কথাই অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, এ কি সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়?" ❑